HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – দূষণ ও দুর্যোগ

টপিক – ০১ মানবসৃষ্ট দূষণ ও তা রোধের উপায়; বায়ু দূষণ

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: মানবসৃষ্ট দূষণ ও তা রোধের উপায়; বায়ু দূষণ
টপিক ০২: মাটি দূষণের কারণ ও তার প্রতিরোধ
টপিক ০৩: পানি দূষণের কারণ ও প্রতিরোধ
টপিক ০৪: শব্দ দূষণের মানবসৃষ্ট কারণ ও নিয়ন্ত্রণের উপায়
টপিক ০৫: দূষণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্পর্ক
টপিক ০৬: পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে পরিবেশ অধিদপ্তরের গৃহীত পদক্ষেপ
টপিক ০৭: প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা
টপিক ০৮: উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনার গুরুত্ব
টপিক ০৯: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ১০: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

মানবসৃষ্ট দূষণ ও তা রোধের উপায়; বায়ু দূষণ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

মানবসৃষ্ট দূষণ ও তা রোধের উপায়; বায়ু দূষণ

দূষণ প্রাকৃতিক পরিবেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সাধারণত পরিবেশে দুই ধরনের দূষণ সংঘটিত হয়। প্রাকৃতিক বিভিন্ন কারণে যেমন পরিবেশ দূষিত হয় তেমনি মনুষ্যসৃষ্ট কারণেও পরিবেশ ব্যাপকভাবে দূষিত হয়। দূষণের ফলে মানুষ ও জীবজন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দূষণজনিত কারণে বিশ্ব উষ্ণায়নের সৃষ্টি হয়ে পৃথিবীর অস্তিত্বও হুমকির মুখে পড়ছে। মানুষ ও প্রকৃতি উভয় মিলে প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান যেমন- মাটি, পানি, বায়ু ও শব্দকে দূষিত করছে। এই পাঠে আমরা জানবো মানুষের দ্বারা কীভাবে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে এবং এই দূষণ কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়।

মানবসৃষ্ট দূষক পদার্থ: মানবসৃষ্ট দূষক পদার্থের মধ্যে রয়েছে লবণাক্ত দূষক, এসিড, জৈব বর্জ্য পদার্থ, শিল্প কারখানার বর্জ্য, কীটনাশক পদার্থ, তেজস্ক্রিয় পদার্থ ইত্যাদি। তেলকূপ খনন কাজের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানিতে ব্রাইন (লবণাক্ত পানি) নির্গত হয়ে থাকে। কয়লা, তামা অনুসন্ধান কাজের সময় পানি সরবরাহ লাইনে এসিড মিশে অনেক সময় সমস্যার সৃষ্টি করে।

বায়ু দূষণের মানবসৃষ্ট কারণ (Air Pollution Caused by Human)

প্রাকৃতিক কারণে যেমন বায়ুদূষণ ঘটে তেমনি মানুষের কর্মকাণ্ডেও নানাভাবে বায়ু দূষিত হচ্ছে। বায়ু দূষণের মানবসৃষ্ট কারণগুলো হলো-

১. মোটর যান: মোটর যান থেকে প্রতিদিন প্রচুর দূষক পদার্থ নির্গত হয়ে বায়ুকে দূষিত করছে। মোটর গাড়ির কারণে বায়ুদূষণের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মোটর যান থেকে যে উপাদানগুলো নির্গত হয়ে বায়ুকে দূষিত করছে সেগুলো হলো হাইড্রোকার্বন, নাইট্রোজেন অক্সাইড, আলোক রাসায়নিক ধোঁয়া ইত্যাদি। এই আলোক রাসায়নিক ধোঁয়া আমাদের শহর কেন্দ্রগুলোতে অধিক দেখা যায়।

২. শিল্প কারখানা: শিল্প কারখানার বিভিন্ন পদার্থ বায়ুর সাথে মিশে বায়ুকে দূষিত করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বায়ু দূষণের একটি বড় অংশ শিল্প কারখানার জন্য হয়ে থাকে। বায়ু দূষণের জন্য প্রধানত দায়ী হচ্ছে পেট্রোলিয়াম শোধনাগার, সার ও সিন্থেটিক রাবার উৎপাদক, সাজসজ্জা ও কাগজশিল্প ইত্যাদি। শিল্পায়ন প্রযুক্তিগত উন্নয়নে সাহায্য করে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করে। কিন্তু বায়ু দূষণের মাধ্যমে পরিবেশের গুণগত মান নষ্ট হয়।

৩. পাওয়ার প্লান্ট: যুক্তরাষ্ট্রে ৯০% এর বেশি বৈদ্যুতিক শক্তি তেল ও কয়লা জ্বালানির মাধ্যমে উৎপাদিত হয়। পাওয়ার প্লাস্ট এর জ্বালানি হিসেবে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় সালফার যা সালফার ডাইঅক্সাইড হিসেবে বায়ুতে মিশে বায়ুকে দূষিত করে।

৪. ক্লোরোফ্লুরো কার্বন (CFC-Chloro-Fluoro Carbon): CFC হচ্ছে ক্লোরিন, ফ্লোরিন ও কার্বনের একটি উদ্বায়ী যৌগ। এটি একটি গ্রিন হাউস গ্যাস। এটি রেফ্রিজারেটর, এয়ারকন্ডিশনার, প্লাস্টিক ও রং তৈরির কারখানা হতে নির্গত হয়। CFC বায়ুমণ্ডলের ওজোন (Ozone) স্তরকে ক্রমশ ধ্বংস করছে। স্বাভাবিকভাবে এক অণু CFC অসংখ্য ওজোন অণুকে ধ্বংস করতে পারে। ইতোমধ্যেই ওজোনস্তর অনেক জায়গায় পাতলা হয়ে পড়েছে এবং কোথাও কোথাও ছিদ্র (hole) হয়েছে বলেও ধারণা করা হচ্ছে। ওজোনস্তর ছিদ্র হলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ও কসমিক রশ্মি সরাসরি পৃথিবীতে এসে ফাইটোপ্লাঙ্কটন ও পরে অন্যান্য গাছপালাকে ধ্বংস করে দেবে। সেই সাথে প্রাণিকুলেরও ক্ষতি হবে প্রচুর। ক্যানসার ও অন্যান্য রোগের প্রকোপও বেড়ে যাবে। তাই CFC এর ব্যবহার ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনার তাগিদ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫. আবর্জনাসমূহ: উন্মুক্ত স্থানে মানুষ পৌরবর্জ্য, শিল্পবর্জ্য, বাণিজ্যিক এলাকার বর্জ্য পুড়িয়ে বায়ুকে নানাভাবে দূষিত করছে। একটি সাধারণ ঘরের আবর্জনা পোড়ালে প্রতি টন ময়লার জন্য ২৫ পাউন্ড দূষক নির্গত হয়, যা বায়ুকে দূষিত করছে।

৬. পরিবহন সেবা: পরিবহন সেবার মাধ্যমে মানুষ বায়ুকে প্রতিনিয়ত দূষিত করছে। বন্দর এলাকায় জাহাজের ধোঁয়া ও SO_2 বায়ু দূষণের জন্য দায়ী।

৭. বাণিজ্যিক ও কৃষিকাজ: বায়ু দূষণের অন্যতম উৎস হচ্ছে কোনো কিছুর ধ্বংস, নির্মাণ, পেইন্টিং, স্প্রে ইত্যাদি। এছাড়া কৃষিজমিতে ফসল উঠানোর পর আগুন ধরানো; কৃষি জমিতে সার, কীটনাশক ব্যবহারে তা বায়ুর সাথে মিশে বায়ুকে দূষিত করছে।

মানবসৃষ্ট দূষণ ও তা রোধের উপায়; বায়ু দূষণ

মানবসৃষ্ট বায়ু দূষণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Prevention of Air Pollution Caused by Human)

মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপ বায়ুকে যেভাবে দূষিত করছে তাতে জীবন ও পরিবেশ আজ হুমকির মুখে। বায়ু দূষণ প্রতিরোধে নিম্নোক্ত পন্থাগুলো অবলম্বন করা যায়-

১. নির্দিষ্ট স্থানে শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা: যত্রতত্র শিল্পকারখানা গড়ে তুললে বায়ু দূষণ বৃদ্ধি পায়। যেখানে শিল্প কারখানা গড়ে উঠবে সেখানে আবাসিক এলাকা থাকবে না। কলকারখানার চিমনি উঁচু করে তৈরি করা এবং কারখানার চারিদিকে প্রচুর বৃক্ষরোপণ করা।

২. বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার: কয়লা, খনিজ তেল, গ্যাস শক্তির পরিবর্তে জ্বালানির উৎস হিসেবে বেশি পরিমাণে সৌর, বায়ু, ভূতাপীয় শক্তি, জৈব গ্যাস ব্যবহার করলে বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

৩. বৃক্ষরোপণ বৃদ্ধি: বৃক্ষ নিধনের ফলে বাতাসে CO_2 গ্যাসের পরিমাণ বাড়ছে। বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের ভারসাম্য রক্ষার জন্য অরণ্যভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা আবশ্যক। বৃক্ষ বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের ঘাটতি গাছপালাই পূরণ করে থাকে। গাছপালা শুধু অক্সিজেন সরবরাহ এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হয় না; গাছ প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা, বায়ু শোষণ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

৪. ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা: ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরকারিভাবে বায়ু দূষণ প্রতিরোধ করা যায়। যানজট প্রতিরোধ ও নির্দিষ্ট রাস্তায় নির্দিষ্ট যানবাহন চলাচল করলে যানবাহনের জ্বালানি দূষণ কমানো সম্ভব, যা বায়ুদূষণ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখবে। ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখা উচিত তা হচ্ছে ট্রাফিক সিগন্যাল, একমুখী সড়ক তৈরি, যানবাহন পার্কিং সুবিধার উন্নতি, বিভিন্ন গতির গাড়ির জন্য ভিন্ন ভিন্ন সড়ক তৈরি ও ব্যবহার। সর্বোপরি ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বায়ুদূষণ প্রতিরোধে সরকারের পাশাপাশি যানবাহন মালিক ও চালকদেরও সচেতন হতে হবে।

৫. মানুষের সচেতনতা: রেফ্রিজারেটর ও এয়ার কন্ডিশনারে ব্যবহৃত ক্লোরোফ্লুরো কার্বন ওজোন স্তরের যে মারাত্মক ক্ষতি করে সে সম্পর্কে মানুষের মধ্যে কোনো সচেতনতা নাই। কিন্তু এ সম্পর্কে মানুষ সচেতন থাকলে বায়ু দূষণ প্রতিরোধ করা যাবে।

৬. বায়ুর গুণগত মান পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন: বায়ুদূষণ প্রতিরোধে সরকার বায়ুর গুণগত মান মনিটরিং ও মূল্যায়ন করতে পারে। মান পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে সরকার কার্যকরী কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে, যা বায়ু দূষণ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – দূষণ ও দুর্যোগ

টপিক – ০২ মাটি দূষণের কারণ ও তার প্রতিরোধ

মাটি দূষণের কারণ ও তার প্রতিরোধ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

মাটি দূষণের কারণ ও তার প্রতিরোধ

মাটি বলতে আমরা পৃথিবীর উপরিভাগের স্তরকে বুঝি যা অপেক্ষাকৃত নরম এবং নানা ধরনের জৈব ও অজৈব পদার্থের মিশ্রণে গঠিত। মাটির উপরে আমরা বসবাস করি। মাটি থেকে আমাদের জীবনধারণের নানা রকম প্রয়োজনীয় উপাদান গ্রহণ করি। উদ্ভিদ ও প্রাণী মরে গেলে এগুলো আবার মাটিতে ফিরে যায়। এভাবে মাটির বিভিন্ন উপাদান আমরা পর্যায়ক্রমে বার বার ব্যবহার করতে পারি। তাই বলা যায় মাটির সাথে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। মাটি দূষিত হলে আমাদের জীবনযাত্রায় মারাত্মক প্রভাব পড়ে। মাটিতে যখন বিষাক্ত যৌগ, রাসায়নিক উপাদান, লবণ, তেজস্ক্রিয় পদার্থ অথবা রোগ সৃষ্টিকারী কোনো জৈব বা অজৈব উপাদান যুক্ত হয় যা উদ্ভিদের বেড়ে ওঠা অথবা প্রাণীর জন্য ক্ষতিকর তখন তাকে মৃত্তিকা বা মাটি দূষণ বলে।

মাটি দূষণের কারণ ও তার প্রতিরোধ

মাটি দূষণের কারণ (Causes of Soil Pollution)

মানুষের নানা কাজ মাটিকে দূষিত করে। বন ও গাছপালার ধ্বংস সাধন, অতিমাত্রায় কৃষিকাজ, অতিরিক্ত পানিসেচ ইত্যাদির কারণে মাটি দূষিত হয়। গাছপালা না থাকলে এবং অতিমাত্রায় কৃষিকাজ করলে মাটির উর্বর স্তর ক্ষয় হয়ে মাটি অনুর্বর হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত পানিসেচের ফলে মাটিতে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততার সৃষ্টি হয়। মাটির নিচের লবণ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে উপরে উঠে এসে মাটিকে অনুর্বর করে তোলে। নানা ধরনের বর্জ্য পদার্থ মাটি দূষণের অন্যতম কারণ। ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ এবং প্রকৃতিতে ধীরে ধীরে মিশে যায় না এমন পদার্থ (পলিথিন, প্লাস্টিক) মাটিকে দূষিত করে। এগুলোকে অবিনাশী বর্জ্য বলে।

মাটি দূষণ প্রতিরোধ (Prevention of Soil Pollution)

মাটি দূষিত হলে তাতে গাছপালা, পোকামাকড়, অণুজীব জন্মাতে পারে না। এর ফলে মাটি অনুর্বর হয়ে ধীরে ধীরে মানুষের ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য উর্বর উৎপাদনশীল মাটি প্রয়োজন। এ কারণে মাটি যাতে অনুর্বর ও দূষিত না হয় আমাদের সবারই সেদিকে নজর দেয়া প্রয়োজন। বেশি করে গাছপালা লাগানো মাটি দূষণ রোধের একটি উপায়। জমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার সীমিত করা প্রয়োজন। কলকারখানাগুলো যেন বর্জ্য যেখানে সেখানে না ফেলে সে বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। আমরা সবাই মাটি দূষণের বিরুদ্ধে সচেতন হলে দূষণ রোধ করা সম্ভব।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – দূষণ ও দুর্যোগ

টপিক – ০৩ পানি দূষণের কারণ ও প্রতিরোধ

পানি দূষণের কারণ ও প্রতিরোধ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

পানি দূষণের কারণ ও প্রতিরোধ

পানির সাথে বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থ মিশ্রিত হয়ে যদি পানির প্রাকৃতিক, রাসায়নিক ও জৈবিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয় এবং তার ফলে জলজ উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের অপূরণীয় ক্ষতি হয় বা তার আংশকা থাকে তাকে পানি দূষণ বলে।

পানি দূষণের কারণ ও প্রতিরোধ

পানি দূষণের কারণ (Causes of Water Pollution)

বিভিন্ন কারণে পানি দূষিত হয়ে থাকে। যেমন-

১. তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থ (Radio-Active Wastage): বর্তমানে মানুষ তাদের ঘর উষ্ণ রাখা ও খাদ্য সংরক্ষণের জন্য, শিল্পের শক্তি ও গাড়ির জ্বালানি সরবরাহের জন্য বিভিন্ন ধরনের পরমাণু ও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করে থাকে। পারমাণবিক চুল্লি ও অন্যান্য পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে উদ্ভূত তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলো উন্মুক্ত জলরাশিতে সহজেই মিশে গিয়ে উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্ষতিসাধন করে।

২. মড়ক ও আগাছা দমনকারী ওষুধ (Pesticides and Herbicides):

মানুষ উন্নতমানের বীজ, সার, উন্নত সেচ ব্যবস্থা ও বিভিন্ন ধরনের মড়ক, আগাছা ও পোকা দমনকারী ওষুধ ইত্যাদি ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করছে। এ ধরনের ওষুধসমূহ যখন উদ্ভিদের উপর ছড়ানো হয় তখন এগুলো মাটিস্থ পানির সাথে মিশে পানিকে দূষিত করে। এছাড়া ওষুধগুলো বৃষ্টির পানির সাথে নদী ও সাগরে গিয়ে পড়ে এবং জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহে জমা হয়। এতে জলজ জীবের ক্ষতিসাধন হয়।

৩. এসিডসমূহ (Acids): খনি হতে নির্গত এসিডসমূহ পানিতে মিশে এসিডের হার বৃদ্ধি করে থাকে। পানিতে এসিডের পরিমাণ অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পেলে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্যে তা হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।

৪. নর্দমার ময়লা (Domestic Sewage): নদী বা কূপ হতে আমরা খাওয়ার পানি সরবরাহ করে থাকি। এগুলো সাধারণত নর্দমার ময়লা দ্বারা দূষিত হয়। শহরাঞ্চলের নর্দমাগুলো সাধারণত নদীতে গিয়ে শেষ হয়। এগুলো দ্বারা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের মলমূত্র ও অন্যান্য ময়লা-আবর্জনা নদীতে পতিত হয়। এছাড়া মানুষ বা অন্যান্য পশুর মল, অথবা ফেলে দেওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়া খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি নদীতে পতিত হলে এগুলো ব্যাকটেরিয়ার প্রভাবে অজৈব পদার্থে রূপান্তরিত হয়। ব্যাকটেরিয়াসমূহের এ ধরনের কার্যাবলির জন্য প্রচুর অক্সিজেন খরচ হয়। ফলে পানি দূষিত হয় এবং তা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। যেমন- ঢাকার নর্দমার ময়লার মাধ্যমে বুড়িগঙ্গার পানি দূষণ।

৫. শিল্পের আবর্জনা (Industrial Wastage): শিল্পবিপ্লবের শুরু থেকেই শিল্পসমূহ হতে নির্গত ময়লা ও আবর্জনা নদী ও সমুদ্রের পানি দূষিত হওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। কাগজ ও কাগজমণ্ড, বস্ত্র, চিনি, সার, লৌহ জাতীয় ধাতু, চামড়া ও রাবার, ওষুধ ও রাসায়নিক শিল্প-কারখানা হতে নির্গত আবর্জনাসমূহ বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানে গঠিত। এগুলো পানিতে মিশে পানিকে দূষিত করে। যেমন- নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদীর পানি দূষণ।

৬. কঠিন আবর্জনা (Solid Wastage): প্লাস্টিক, পলিথিন, রাবার, অ্যাসবেস্টস ইত্যাদি দ্বারা পরিবেশ দূষিত হয়। এসব পদার্থ দ্বারা তৈরি দ্রব্যাদি সহজে নষ্ট হয় না এবং সহজে তার রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে না। ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য অণুজীব এর উপর কোনো বিক্রিয়া করতে পারে না। তাই এসব পদার্থগুলো পানিতে পড়ে পানি দূষিত করে।

পানি দূষণের কারণ ও প্রতিরোধ

পানি দূষণ রোধের উপায় (Prevention of Water Pollution)

১. কীটনাশক ও সারের নিয়ন্ত্রণ: কীটনাশক, ছত্রাকনাশক, আগাছানাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার সীমিত রাখা এবং এদের ব্যবহারে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এর বিকল্প হিসেবে জৈব সার ও প্রাকৃতিক কীটনাশকের ব্যবহার বাড়াতে হবে।

২. তেল নিষ্কাশন নিয়ন্ত্রণ: পানিতে তেল নিষ্কাশন বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।

৩. জলাশয়ে গোসল ও কাপড়কাঁচা বন্ধ রাখা: পুকুরসহ অন্যান্য আবদ্ধ জলাশয়ে গোসল ও কাপড়কাঁচা নিষিদ্ধ করতে হবে।

৪. কচুরিপানা ও শৈবাল নিয়ন্ত্রণ: জলাশয়, খাল-বিল যাতে কচুরিপানা ও ভাসমান শৈবালে ভরে না যায়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

৫. খনিজ পদার্থের নিয়ন্ত্রণ: খনিজ বর্জ্য যাতে নদী ও সমুদ্রের পানিতে শোধনপূর্বক নির্গত হয়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

৬. বিষাক্ত বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ: শিল্প-কারখানার বিষাক্ত বর্জ্য, নদী-নালা ও অন্যান্য জলাশয়ে না ফেলা।

৭. বর্জ্য ও আবর্জনা শোধন:

i. শিল্প-কারখানার দূষিত অপ্রয়োজনীয় তরল বর্জ্য যথাযথভাবে শোধনপূর্বক নদী-নালাতে নিক্ষেপ করতে হবে।

ii. পয়ঃপ্রণালী ও গৃহস্থালির আবর্জনা ও ময়লা জলাশয়ে নিষ্কাশনের পূর্বে যথাযথভাবে শোধন করা।

iii. পয়ঃপ্রণালী বাহিত আবর্জনাগুলোকে নদীতে নিক্ষেপ করার পূর্বে ফিল্টার ট্যাংক বা জারণ ট্যাংক এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করতে হবে।

iv. ফিল্টার ও জারণ ট্যাংকগুলোতে বিয়োজক অণুজীব রেখে পয়ঃপ্রণালী বাহিত জৈব আবর্জনাগুলোকে এমনভাবে পরিবর্তিত করতে হবে, যাতে তারা ক্ষতিকর অবস্থায় না থাকে।

পানি দূষণের কারণ ও প্রতিরোধ

৮. আইন প্রয়োগ: পরিবেশ বিষয়ক কঠোর আইন প্রণয়ন করা ও তার প্রয়োগ নিশ্চিত করা দরকার। ইউরোপীয় দেশগুলোতে পানিদূষণের বিরুদ্ধে কঠোর আইন রয়েছে। যেমন- জলজ যানবাহনের তেল, ময়লা আবর্জনা প্রভৃতি থেকে যেন পানি দূষিত না হয়, তার ব্যবস্থা জলযানকে নিতে হয়, না নিলে কঠোর শাস্তি বা জরিমানা দিতে হয়।

৯. কূটনৈতিকভাবে নদীতে পানি প্রবাহের সুষ্ঠু বণ্টন: নদীতে পানি প্রবাহ কম থাকলে এতে পলি জমে নদীর গভীরতা কমে যায়। ফলে বর্জ্য, আবর্জনা দ্রুত স্থানান্তর না হতে পেরে পানিদূষণের সৃষ্টি হয় ও বন্যার প্রকোপ ঘটে। বাংলাদেশের পদ্মা নদীমুখে ভারতের দেওয়া ফারাক্কাসহ বিভিন্ন বাঁধের ফলে দেশের নদীগুলোর অবস্থা বর্তমানে সংকটাপন্ন। তাই কূটনৈতিক ও আন্তর্জাতিকভাবে আলোচনা ও চাপ সৃষ্টি করে প্রতিবেশী দেশের সাথে এ সমস্যার সমাধান করতে হবে।

১০. গণসচেতনতা বৃদ্ধি: স্কুল-কলেজে পানি দূষণ সম্পর্কিত শিক্ষা এবং রেডিও, টেলিভিশন ও পত্রিকার মাধ্যমে ব্যাপক হারে গণসচেতনতা সৃষ্টি করার মাধ্যমে পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – দূষণ ও দুর্যোগ

টপিক – ০৪ শব্দ দূষণের মানবসৃষ্ট কারণ ও নিয়ন্ত্রণের উপায়

শব্দ দূষণের মানবসৃষ্ট কারণ ও নিয়ন্ত্রণের উপায়

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

শব্দ দূষণের মানবসৃষ্ট কারণ ও নিয়ন্ত্রণের উপায়

শব্দ দূষণের কারণ (Causes of Noise Pollution)

শব্দ দূষণের বিভিন্ন কারণ অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১. সামাজিক কারণ:

ক. মিটিং-মিছিল প্রভৃতিতে, বিয়েশাদিতে এবং অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত মাইকের উচ্চ-তীব্র শব্দে মানুষের ক্ষতি হয়।

খ. বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আতশবাজি পোড়ানোর রীতি আমাদের সমাজে প্রচলিত। কিন্তু আতশবাজি পোড়ানোর ফলে এর অনিয়মিত এবং তীব্র শব্দে অবর্ণনীয় শব্দ দূষণ ঘটে। এটি মানুষের অপূরণীয় ক্ষতি করে থাকে।

গ. নগরীয় জীবনে জঞ্জাল অপসারণ এবং অবকাঠামো নির্মাণ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডও শব্দ দূষণের সৃষ্টি করে।

২. পরিবহন; শব্দদূষণের প্রধান উৎস পরিবহন। ডিজেল ইঞ্জিনযুক্ত যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পরিবহনজনিত শব্দদূষণের কারণ। বাস, ট্রাক, লরি, কার, মোটরসাইকেল প্রভৃতি চলাচলের শব্দ এবং অনিয়ন্ত্রিতভাবে উচ্চ-তীব্রতাযুক্ত বৈদ্যুতিক হর্নের ব্যবহারের ফলে শহরের ট্রাফিক অঞ্চলে, হাসপাতাল সংলগ্ন রাস্তায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য কর্মব্যস্ত স্থানে শব্দ দূষণ সৃষ্টি হয়।

শব্দ দূষণের মানবসৃষ্ট কারণ ও নিয়ন্ত্রণের উপায়

৩. শিল্প প্রক্রিয়া: বিভিন্ন শিল্প সংস্থায় প্রক্রিয়াকরণের সময় যান্ত্রিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন শব্দ কর্মরত শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মী এবং পার্শ্বস্থ অঞ্চলের জনবসতির উপর শব্দদূষণজনিত প্রভাব সৃষ্টি করে। যেমন- নিউজপেপার প্রেস (100 dB), টেক্সটাইল লুম এবং চাবি পাঞ্চিং মেশিন (180 dB) এর প্রক্রিয়াকরণ কাজের ফলে শব্দদূষণ সৃষ্টি হয়।

৪. যান্ত্রিক ক্রিয়া: অফিস, দোকান, স্কুল, কলেজ এবং অন্যান্য সামাজিক কাজে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে ডিজেল চালিত জেনারেটর ব্যবহৃত হয়, এর ফলে শব্দদূষণ সৃষ্টি হয়। এরকম আরও উদাহরণ- মোটর বাইক, শ্যালো মেশিনের ইঞ্জিন চালনা ইত্যাদি।

৫. আকাশ পরিবহন: আকাশ পরিবহনজনিত কারণেও শব্দদূষণ ঘটে। বিমানবন্দরের রানওয়েতে বিমান চালু করার সময় এবং আকাশপথে উড়ার সময় ভয়ানক শব্দদূষণ সৃষ্টি হয় (110 dB)। অপেক্ষাকৃত বড় এবং গতিশীল জেট বিমান কর্তৃক সৃষ্ট শব্দদূষণের মাত্রা অনেক বেশি। পাশ্চাত্যের আধুনিক সুপারসোনিক এয়্যারকর্‌্যাফট (যথা-অতিশয় দ্রুতগতিসম্পন্ন কনকর্ড) যন্ত্রণাদায়ক শব্দদূষণের সৃষ্টি করে।

৬. কথোপকথন: মানুষের উচ্চস্বরে কথা বলার সময়ও শব্দদূষণ সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিক স্বরে মানুষের কথোপকথনের সময় শব্দ দূষণ উৎপন্ন হয় না (60 dB)। কিন্তু কোনো জমায়েত স্থলে, অফিসে, রেস্টুরেন্টে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চস্বরে কথা বলার ফলে যন্ত্রণাদায়ক শব্দদূষণের (85dB) সৃষ্টি হতে পারে।

শব্দ দূষণের মানবসৃষ্ট কারণ ও নিয়ন্ত্রণের উপায়

শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ (Noise Pollution Control)

জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি, মানুষের ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপ, যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত শিল্পায়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার ত্রুটি এবং ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে লাউড স্পিকার নিঃসৃত শব্দের ব্যাপকতায় শব্দদূষণ বর্তমানে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করছে।

শব্দদূষণে মানুষ ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব দেখা দেয়। এই অবস্থায় শিল্প-কারখানায়, পরিবহন ব্যবস্থায় এবং সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে শব্দদূষণ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ জরুরি। তিনটি উপায়ে শব্দদূষণ প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যথা-

১. আইনসম্মত

২. প্রযুক্তিগত এবং

৩. ব্যক্তিগত উপায়

শব্দ দূষণের মানবসৃষ্ট কারণ ও নিয়ন্ত্রণের উপায়

১. আইনসম্মত উপায়ে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ; শব্দ দূষণ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণমূলক আইন তৈরি এবং প্রয়োগের মাধ্যমে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণমূলক আইন প্রয়োগ করা যেতে পারে:

i. উৎস থেকে নির্গত শব্দের সুনির্দিষ্ট তীব্রতা সম্পর্কীয় আইন প্রণয়ন করা উচিত। বাস, ট্রেন, এরোপ্লেন, শিল্প কারখানা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে লাউড স্পিকার নিঃসৃত শব্দের তীব্রতা নির্দেশিত মাত্রায় বা তার নিচে বজায় রাখা জরুরি। এক্ষেত্রে অবশ্যই আইনভঙ্গকারীর কঠোর শাস্তির বিধান থাকা উচিত।

ii. যানবাহন নিঃসৃত শব্দের ব্যাপকতা এবং তীব্রতা হ্রাসের জন্য আইন করে উন্নত প্রযুক্তির ডিজেল ইঞ্জিন এবং এগজস্ট গ্যাস (যেমন- কার্বন মনোঅক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড) পাইপে সাইলেন্সারের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা উচিত।

iii. আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগের মাধ্যমে জনবহুল অঞ্চল থেকে দূরবর্তী স্থানে হাইওয়েগুলোর বুট চালু করা উচিত।

iv. ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় শব্দ উৎপাদনকারী শিল্প কারখানার স্থাপন নিষিদ্ধ করা দরকার।

V. যানবাহনের গতি হ্রাস করে এবং 'নন-স্টপ' রীতি চালু করে শব্দদূষণ হ্রাস করা যায়। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আইন থাকা বাঞ্ছনীয়।

শব্দ দূষণের মানবসৃষ্ট কারণ ও নিয়ন্ত্রণের উপায়

vi. হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, আদালত এবং অফিস সংলগ্ন অঞ্চলে শব্দ উৎপাদন নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। এসব অঞ্চলে গাড়ির হর্ন বা লাউড স্পিকারের মাধ্যমে শব্দদূষণকারীকে কঠোর শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

vii. ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে আতশবাজির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা উচিত এবং লাউড স্পিকার ব্যবহারের জন্য সময় এবং তীব্রতার মাত্রা নির্দিষ্ট করা উচিত।

শব্দ দূষণের মানবসৃষ্ট কারণ ও নিয়ন্ত্রণের উপায়

২. প্রযুক্তিগত উপায়ে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ: প্রযুক্তির ব্যবহার দ্বারা শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। এর মাধ্যমে যানবাহন, মেশিন বা অন্যান্য শব্দ উৎপন্নকারী যন্ত্রপাতি থেকে উৎপন্ন শব্দের তীব্রতা হ্রাস করা যায়। নিম্নলিখিত উপায়ে এ জাতীয় শব্দদূষণ প্রতিরোধ বা হ্রাস করা যেতে পারে:

i. উৎসস্থলে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ: শিল্প কারখানায় উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন কম শব্দ উৎপন্নকারী মেশিন স্থাপন করে উৎসস্থলে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

ii. শব্দ প্রতিরোধক আচ্ছাদন ব্যবহার: কারখানা বা শিল্প সংস্থায় শব্দ উৎপন্নকারী মেশিন বা যন্ত্রপাতি শব্দ অপরিবাহী বা অভেদ্য বস্তুর দ্বারা আচ্ছাদিত করে শব্দদূষণ হ্রাস করা যায়।

iii. শব্দ প্রতিরোধক ডিভাইস ব্যবহার: দূষণস্থলে শব্দ প্রতিরোধক
ডিভাইস (device) ব্যবহারে অনুপ্রাণিত করে শব্দদূষণের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করা যায়। শব্দ প্রতিরোধক ডিভাইস শ্রবণ প্রতিরক্ষা কৌশল (Hearing Protection Device) বা HPD নামেও পরিচিত। প্রধানত তিন ধরনের HPD পাওয়া যায়- (a) ইয়ার প্লাগ-(Ear plugs), (b) ক্যানাল ক্যাপ (Canal caps) এবং (c) ইয়ার মাফ (Ear muff)। ইয়ার প্লাগ কম স্পন্দনযুক্ত এবং ইয়ার মাফ অধিক স্পন্দনযুক্ত শব্দের ক্ষেত্রে উপযোগী।

iv. অ্যাকোসটিক জোনিং: শিল্প-কারখানায় বায়ু বা কঠিন মাধ্যমে শব্দের সঞ্চারণ প্রতিরোধক 'অ্যাকোসটিক জোনিং' (Acoustic zoning) ব্যবহার করে শব্দদূষণ প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

৩. ব্যক্তিগত উপায়ে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ: নিম্নলিখিত উপায়ে ব্যক্তিগত উপায়ে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব:

i. পেশাগত কাজে শব্দ প্রতিরোধক ডিভাইস ব্যবহারের মাধ্যমে দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যেমন- মোবাইলের রিংটোন কমিয়ে রাখা, এয়ারফোন ব্যবহার করা।

ii. ব্যক্তিগত কাজ যথা- ক্লিনিং, ওয়াশিং, টয়লেট ফ্লাশিং, গার্বেজ ডিসপোজাল, বিনোদনে ব্যবহৃত রেডিও, টিভি এবং সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবে ব্যবহৃত লাউড স্পিকার থেকে সৃষ্ট শব্দদূষণ নিজ উদ্যোগে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। উপরিউক্ত ক্রিয়াকলাপে শব্দের তীব্রতা মাত্রা ৭৫ dB থেকে ১২০ dB হলে তা যথেষ্ট ক্ষতিকারক।

iii. বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শহর এবং নগর রূপায়ণ করে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে তা করতে হবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – দূষণ ও দুর্যোগ

টপিক – ০৫ দূষণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্পর্ক

দূষণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্পর্ক

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

দূষণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্পর্ক

পরিবেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের যেকোনো নেতিবাচক পরিবর্তনই হলো দূষণ। অন্যদিকে মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর প্রতিকূল প্রভাব রয়েছে এমন যেকোনো প্রাকৃতিক ঘটনাই হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিস্তার এবং প্রভাব পৃথিবীর সবদেশে সমান নয়। স্বভাবতই উন্নত দেশসমূহের অধিবাসীদের তুলনায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে উন্নয়নশীল দেশসমূহের অধিবাসীদের ঝুঁকির মাত্রা অধিক। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দূষণের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান। অনেক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলে দূষণ বৃদ্ধি পেয়ে পরিবেশ আরো বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। যেমন: বন্যা, খরা, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প ইত্যাদি। আবার অনেক সময় দূষণের মাত্রা বেড়ে গেলে দীর্ঘ সময় পরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হতে পারে। যেমন: শিল্পায়নের ফলে বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, মাটি দূষণ হয়। পরবর্তীতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে এসব দূষণের ফলে সংঘটিত হয় দুর্যোগ। যেমন- বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি। সুতরাং দূষণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্পর্ককে আমরা দুইভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি:

১. প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে দূষণ সৃষ্টি

২. দূষণের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি

প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে দূষণ সৃষ্টি (Pollution Occured by Natural Disaster)

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বর্তমান বিশ্বে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে। কেননা প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুধু জানমালের ক্ষতি ও মৃত্যুর কারণই নয় বরং এর ফলে পরিবেশ দূষণ ঘটে এবং মানুষ স্থায়ীভাবে বিভিন্ন ক্ষতির সম্মুখীন হয়। দূষণের জন্য দায়ী প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়-

i. বায়ুমণ্ডলীয় দুর্যোগ (ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখী, টর্নেডো, হারিকেন, খরা ইত্যাদি)।

ii. ভূপৃষ্ঠের প্রক্রিয়াসৃষ্ট দুর্যোগ (বন্যা, নদী ভাঙন, উপকূলীয় ভাঙন, ভূমিধস, ভূমিক্ষয়, ভূগর্ভস্থ পানি দূষণ ইত্যাদি)।

iii. ভূঅভ্যন্তরে সৃষ্ট দুর্যোগসমূহ (ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি, সুনামি)।

দূষণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্পর্ক

i.বায়ুমণ্ডলীয় দুর্যোগ: প্রথমত বায়ুমণ্ডলীয় দুর্যোগ যেমন: ঝড়, ঘূর্ণিঝড় যখন শুরু হয় তখন প্রবল বেগে বায়ু ঘুরতে ঘুরতে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকার দিকে যেতে থাকে। এ সময় এক এলাকার ধূলি, বালুকণা ইত্যাদি, বিষাক্ত পদার্থ ও নানা রকম গ্যাস ঐ ঘূর্ণায়মান ঝড়ের মধ্যে মিশে অন্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বায়ুমণ্ডলীয় দুর্যোগে বিভিন্ন এলাকা দূষিত হচ্ছে। অনেক সময় বজ্রপাতের কারণে বন জঙ্গলে আগুন ধরে যায়। প্রচণ্ড বেগে বায়ু প্রবাহিত হলে ঘর্ষণে জঙ্গলে দাবানল আগুন ধরে যায়। প্রচণ্ড বেগে বায়ু প্রবাহিত হলে ঘর্ষণে জঙ্গলে দাবানল সৃষ্টি হয়। ফলে বায়ু দূষিত হয়। বায়ুমণ্ডলীয় বিভিন্ন দুর্যোগের ফলে বিপুল পরিমাণ নাইট্রোজেন অক্সাইড, হাইড্রোকার্বন এবং ক্ষতিকর ওজোন গ্যাস ইত্যাদি সহজেই বায়ুর বিভিন্ন স্তরের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট করছে। এই দূষিত বায়ুর প্রভাব ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। এ বিষাক্ত গ্যাস শুধু যে বিশ্ব উষ্ণায়ন সৃষ্টি করে বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরের ক্ষতি করছে তা নয় বরং এর প্রভাবে মানুষ, উদ্ভিদ ও প্রাণী মৃত্যুর ঝুঁকিতে পড়ছে।

দূষণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্পর্ক

iii. ভূঅভ্যন্তরে দুর্যোগসমূহ: ভূঅভ্যন্তরস্থ প্রক্রিয়াসৃষ্ট দুর্যোগসমূহের মধ্যে রয়েছে ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে অনেক সময় মাটি, পানি ও বায়ু দূষণ ঘটে। ভূমিকম্প একটি ভূগর্ভস্থ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যা একবার সংঘটিত হলে হাজার হাজার প্রাণহানি ঘটে আবার পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান যেমন- পানি, মাটি দূষিত হয়। ১৯৮৮ সালে ৭ ডিসেম্বর আর্মেনিয়াতে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে লক্ষাধিক লোক মাটির নিচে চাপা পড়ে এবং ৪ লক্ষাধিক লোক গৃহহীন হয়ে পড়ে। এই ভূমিকম্পে লক্ষাধিক লোক মাটিতে চাপা পড়ায় উক্ত অঞ্চলের মাটি দূষিত হয়ে গিয়েছিল। মানুষের মৃতদেহ মাটির সাথে মিশে এই দূষণ সৃষ্টি হয়েছিল। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কারণেও দূষণ ঘটে। আগ্নেয়গিরির লাভার নিচে চাপা পড়ে মানুষ ও জীবজন্তু প্রাণ হারায় এতে উক্ত এলাকার মাটি, পানি ও বায়ু দূষিত হয়। আগ্নেয়গিরির লাভার সাথে ভূগর্ভস্থ বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থ ও গ্যাস নির্গত হয় যা উক্ত এলাকার মাটি, পানি ও বায়ুর সাথে মিশে দূষণ ঘটায়। ১৯৮৬ সালে মেক্সিকোতে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ১০ হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটেছিল। ২০০৮ সালে চীনের সিচুয়ান প্রদেশে যে ভূমিকম্প হয় তাতে শিল্পকারখানা ধসে মৃত্তিকা ও বায়ুদূষণ ঘটে। এতে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগটির ফলাফলস্বরূপ পরিবেশ দূষণও মারাত্মক ছিল।

দূষণের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি (Pollution Resulting in Disasters)

বর্তমান বিশ্বে নগরায়ণ ও শিল্পায়ন বৃদ্ধি পাওয়ায় দিন দিন দূষণের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। দূষণ মূলত মনুষ্যসৃষ্ট একটি দুর্যোগ। মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপের কারণে পরিবেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানের মান নিচে নেমে গেলে তাকে দূষণ বলে। যেমন: মাটি দূষণ, পানি দূষণ, বায়ুদূষণ ইত্যাদি। আবার এই দূষণের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগও সৃষ্টি হয়। তবে এটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফল। দীর্ঘদিন কোনো একটি দূষণের ফলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়।

দূষণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্পর্ক

দূষণের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি (Pollution Resulting in Disasters)

বর্তমান বিশ্বে নগরায়ণ ও শিল্পায়ন বৃদ্ধি পাওয়ায় দিন দিন দূষণের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। দূষণ মূলত মনুষ্যসৃষ্ট একটি দুর্যোগ। মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপের কারণে পরিবেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানের মান নিচে নেমে গেলে তাকে দূষণ বলে। যেমন: মাটি দূষণ, পানি দূষণ, বায়ুদূষণ ইত্যাদি। আবার এই দূষণের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগও সৃষ্টি হয়। তবে এটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফল। দীর্ঘদিন কোনো একটি দূষণের ফলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়।

৫ এপ্রিল ২০১২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের MET কার্যালয় গবেষণা করে দেখিয়েছে যে, শিল্প কারখানার কারণে যে বায়ুদূষণ হয় তা থেকে খরা, বন্যা ও হারিকেনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি হতে পারে। এই সংস্থাটি আটলান্টিক মহাসাগরের উপর গবেষণা করে দেখেছে যে, বায়ুদূষণ আটলান্টিক মহাসাগরের তাপমাত্রা পরিবর্তনের জন্য দায়ী। আবার এ্যারোসল ব্যবহারে যে বায়ুদূষণ হয় সংস্থাটি একে "Dirty pollution" নামে অভিহিত করেছে। এই dirty pollution এবং অগ্ন্যুৎপাতের কারণেও আটলান্টিকের তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়েছে। আটলান্টিকের তাপমাত্রার পরিবর্তন আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও ভারতের বৃষ্টিপাতের ধরনকে প্রভাবিত করছে। এমনকি উত্তর আটলান্টিকে হারিকেন সৃষ্টির প্রবণতা দেখা দিচ্ছে, যা আটলান্টিক মাল্টিডেকাডাল অসিলেশন বা AMO হিসেবে পরিচিত।

দূষণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্পর্ক

আটলান্টিকের তাপমাত্রা পরিবর্তনের ফলে গ্রীষ্মের সময় উত্তর আটলান্টিকে হারিকেনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়, দক্ষিণ আমেরিকায় বৃষ্টিপাত হ্রাস পায় এবং আফ্রিকাতে বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পায়। শীতের সময় এর বিপরীত অবস্থা দেখা দেয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বায়ুদূষণের ফলে তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় এবং এ থেকে হারিকেন, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি হয়। মানুষের অপরিনামদর্শী কার্যক্রমের কারণে মাটি, পানি, বায়ু দূষিত হচ্ছে। বায়ুদূষণের ফলস্বরূপ বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটছে (যেমন-গ্রিন হাউস গ্যাস CO_2 বৃদ্ধির ফলে), বায়ুমণ্ডলের ওজোনস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং বায়ুমণ্ডলীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, হারিকেন ইত্যাদি সংঘটিত হচ্ছে। মাটি দূষণের ফলে ভূমির বা মাটির অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন উপাদানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলে ভূমিধস, ভূমিক্ষয় বা উপকূলীয় ভাঙনের মতো দুর্যোগের সৃষ্টি হয়। সুতরাং দূষণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে এবং এদের একটির মাত্রা বৃদ্ধি বা হ্রাস পেলে অপরটি পরিবর্তিত হয়।

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – দূষণ ও দুর্যোগ

টপিক – ০৬ পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে পরিবেশ অধিদপ্তরের গৃহীত পদক্ষেপ

পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে পরিবেশ অধিদপ্তরের গৃহীত পদক্ষেপ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে পরিবেশ অধিদপ্তরের গৃহীত পদক্ষেপ

রাসায়নিক, ভৌতিক ও জৈবিক কারণে পরিবেশে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের যেকোনো নেতিবাচক পরিবর্তনই হলো দূষণ। মানুষ এই প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান যেমন: বায়ু, পানি, মাটি ইত্যাদিকে বিভিন্নভাবে দূষিত করছে। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অপরিকল্পিত নগরায়ণের কারণে মাটি, পানি, বায়ু, বিভিন্নভাবে দূষিত হচ্ছে এবং জনজীবন হুমকির মুখে পতিত হচ্ছে। সরকারি, বেসরকারি এমনকি বিদেশি সহায়তায় এই দূষণ প্রতিরোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। সরকারের পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে ১৯৮৯ সালে পরিবেশ অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তরকে সুরক্ষা, পরিবেশ উন্নয়ন ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের লক্ষ্য: পরিবেশ অধিদপ্তরের বর্তমান লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে দূষণমুক্ত বসবাসযোগ্য একটি সুস্থ, সুন্দর ও মডেল বাংলাদেশ গড়ে তোলা। নিম্নে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপগুলো আলোচনা করা হলো-

পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে পরিবেশ অধিদপ্তরের গৃহীত পদক্ষেপ

১. দূষণ জরিপ: পরিবেশ অধিদপ্তরের দূষণ প্রতিরোধে একটি অন্যতম পদক্ষেপ হলো দেশের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে দূষণ জরিপ পরিচালনা করা। সাধারণত বিভিন্ন শিল্প কারখানা দ্বারা দূষণ বেশি হয়ে থাকে। এতে পানি দূষণ সবচেয়ে বেশি হয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ নদ-নদী ও জলাশয় দূষিত হওয়ার কারণে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটছে। তাই পরিবেশ অধিদপ্তর শিল্প কারখানায় দূষণ জরিপের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ হ্রাস করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

২. শিল্পদূষণ নিয়ন্ত্রণ: পরিবেশ অধিদপ্তর বাংলাদেশের দূষণ প্রতিরোধে দূষণকারী বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই গৃহীত পদক্ষেপে যেসব শিল্প কারখানা দূষণের সাথে জড়িত অর্থাৎ কোনো না কোনোভাবে মাটি, পানি ও বায়ু দূষণের সাথে জড়িত সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ও বিধির আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এর প্রাথমিক কার্যক্রম হচ্ছে- মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন/জরিপ পরিচালনা, উদ্বুদ্ধকরণ, নোটিশ প্রদান, প্রযোজ্যক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা অথবা পরিবেশ আদালতে মামলা দায়ের করা।

পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে পরিবেশ অধিদপ্তরের গৃহীত পদক্ষেপ

৩. পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি: পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ এবং তা তদন্তের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা পরিবেশ অধিদপ্তরের অন্যতম একটি পদক্ষেপ। এর প্রাথমিক কার্যক্রম হচ্ছে অভিযোগ বা প্রতিকার প্রার্থনার আবেদনপত্র গ্রহণ, সরেজমিন পরিদর্শন, তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা, প্রযোজ্যক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা। অভিযোগ সর্বোচ্চ তিন মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়।

৪. যানবাহনজনিত দূষণ নিয়ন্ত্রণ: পরিবেশ অধিদপ্তর যানবাহন জরিপ এবং দূষণকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে থাকে। এক্ষেত্রে রাস্তায় চলাচলরত যানবাহন পরীক্ষা ও দূষণকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

৫. বায়ু ও পানির গুণগত মান পরীক্ষা: দেশের বিভিন্ন এলাকায় বায়ু এবং নদী, পুকুর, টিউবওয়েল ও খাবার পানির গুণগত মান নির্ণয়ের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন নদী, পুকুর, টিউবওয়েল ও খাবার পানির গুণগত মান নির্ণয়ের জন্য নমুনা সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ, ডাটা সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা এই পদক্ষেপটির প্রাথমিক কার্যক্রম। তাই বলা যায়, পরিবেশ দূষণে বায়ু ও পানির গুণগত মান পরীক্ষা করা পরিবেশ অধিদপ্তরের একটি অন্যতম কার্যকর পদক্ষেপ।

পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে পরিবেশ অধিদপ্তরের গৃহীত পদক্ষেপ

৬. বায়ুদূষণ প্রতিরোধে পদক্ষেপ গ্রহণ: পরিবেশ অধিদপ্তরের অধীনে পরিবহন ব্যবস্থায় অতিরিক্ত যে বায়ুদূষণ হয় তা প্রতিরোধে সমাজের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে আলোচনা করে কিছু কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। যেমন, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ সংশোধন করা হয়েছে এবং এই সংশোধিত নীতির অধীনে পেট্রোল ও ডিজেল চালিত গাড়ির জন্য অনুঘটক কনভার্টার এবং ডিজেল পার্টিকুলেট ফিল্টার ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উপরন্তু জানুয়ারি ২০০২ থেকে ঢাকা শহরে ২০ বছরের পুরনো ট্যাক্সি, ট্রাক, মিনিট্রাক, ট্যাংক, লরি এবং ২৫ বছরের পুরোনো ভ্যান, মাইক্রোবাস, মিনিবাস, বাস ইত্যাদি চালনায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

৭. ইটভাটার জন্য পদক্ষেপ: শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে ঢাকা শহরের আশপাশে এবং বিভিন্ন বিভাগীয় শহরগুলোর কাছে যত্রতত্র ইটের ভাটা গড়ে উঠেছে। এমনিতেই শহরের যানবাহনের ধোঁয়া ও অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য শহরের দূষণ বাড়ছে, তার ওপর শহরের কাছাকাছি এলাকায় অতিরিক্ত ইটভাটা গড়ে ওঠায় বায়ুদূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে পরিবেশ অধিদপ্তর ইটভাটা গড়ে ওঠায় কিছু শর্ত ও নীতি প্রদান করেছে। যেমন- ইটভাটার চিমনিগুলোর উচ্চতা ১২০ ফুটের নিচে হতে পারবে না এবং কংক্রিট ব্লক ইট উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া, কম সালফার ব্যবহার করা প্রভৃতি।

পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে পরিবেশ অধিদপ্তরের গৃহীত পদক্ষেপ

৮. বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারে পদক্ষেপ; পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে পরিবেশ অধিদপ্তর বিষাক্ত ও বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের নিরাপদ ব্যবহারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে বিষাক্ত এবং বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের আমদানি, পরিবহন, ব্যবহার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে প্রাথমিক কার্যক্রম হচ্ছে- বিষাক্ত এবং বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের আন্তঃদেশীয় চলাচল ও মজুদ বিষয়ে সমীক্ষা পরিচালনা করা, এগুলোর নিরাপদ অপসারণ বা ধ্বংসের লক্ষে কর্মকৌশল প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা।

৯. পলিথিন শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধ: পলিথিন শপিং ব্যাগের যথেষ্ট ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষিত হয়। তাই এই দূষণ প্রতিরোধে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ১ জানুয়ারি ২০০২ থেকে ঢাকা মহানগরী এলাকায় এবং ১ মার্চ ২০০২ থেকে সমগ্র বাংলাদেশে সব ধরনের পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন, ব্যবহার ও বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

১০. পরিবেশগত সচেতনতা বৃদ্ধি: পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই। এ কারণে পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা এবং পরিবেশ বিষয়ক তথ্য সকলের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং পরিবেশ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন করে চলেছে। সচেতনতার উপকরণ হিসেবে এ সংক্রান্ত পোস্টার, লিফলেট, বুকলেট, স্মরণিকা, টিভি স্পট, ডকুমেন্টারি, গণবিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি তৈরি ও প্রচারের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – দূষণ ও দুর্যোগ

টপিক – ০৭ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা

বর্তমান বিশ্ব প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহকে এ কারণে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং এর প্রশমনের জন্য বিশ্বব্যাপী ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস গড়ে উঠেছে। ১৯৬০ সাল থেকে দুর্যোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও প্রতিবছর দুর্যোগের ফলে মানুষের মৃত্যুর হার প্রায় ৬% হারে কমে এসেছে। একই সাথে সম্পদহানির পরিমাণও ক্রমান্বয়ে কমে এসেছে। কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং এ সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা এর কারণ।।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা প্রায়শই ঘটছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, বন্যা, খরা ইত্যাদিকে তাৎক্ষণিক মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো আবহাওয়ার তথ্যভিত্তিক পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ। এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য সরকারি পেশাভিত্তিক দপ্তর হিসেবে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কাজ করে থাকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়নের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো-

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা

ক. প্রাকৃতিক দুর্যোগে জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের যে ক্ষতি হয় তা এড়ানো বা ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করা।
খ. অল্প সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মধ্যে সকল প্রকার ত্রাণ পৌছানো ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা।
গ. দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন করা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলাকে আমরা একটি চক্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারি।
প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রধান চারটি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়। যথা-

১. প্রতিরোধ (Prevention)
২. পূর্বপ্রস্তুতি (Preparedness)
৩. সাড়াদান (Response)
৪. পুনরুদ্ধার (Recovery)

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা

চিত্র-৯.১: প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা

নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো:

১. প্রতিরোধ (Prevention): প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার লক্ষ্যে দুর্যোগের আগে বেশি কাজ সম্পন্ন করতে হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয় তবে এর ক্ষয়ক্ষতি কমানোর ব্যাপারে প্রতিরোধ কার্যক্রম সফলতা বয়ে আনতে পারে। দুর্যোগ প্রতিরোধে কাঠামোগত ও অবকাঠামোগত দুই ধরনেরই ব্যবস্থা নেয়া যায়। কাঠামোগত দুর্যোগ মোকাবিলা করা খুবই ব্যয়বহুল যা অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে বহন করা কষ্টকর। অকাঠামোগত দুর্যোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা স্বল্প ব্যয়ে গ্রহণ করা সম্ভব। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় যেসব প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা হচ্ছে-

ক. বেড়িবাঁধ নির্মাণ: সাধারণত নদী ও সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে বেশি পতিত হয়। তাই উপকূলবর্তী জনগণ, সম্পদ ও পরিবেশ রক্ষার জন্য বেড়িবাঁধ নির্মাণ করে দুর্যোগ প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

খ. আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ: দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলগুলোতে সাধারণত ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখী, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে স্থায়ীভাবে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো উপায় নেই। তাই দুর্যোগ পূর্ববর্তী সময়ে এসব এলাকায় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করে দুর্যোগ প্রতিরোধে সহায়তা করা যায়।

গ. ঘরবাড়ি নির্মাণ পদ্ধতি: ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগে যেরকম বাড়ি তৈরি করা হবে বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে তেমন বাড়ি তৈরি করা ঠিক হবে না। ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলগুলোতে কাঠের বাড়ি নির্মাণ করা হয়। আবার আমাদের দেশ ঘূর্ণিঝড় ও বন্যাপ্রবণ বলে উপকূলীয় ও প্লাবন ভূমি এলাকায় বাড়ির ভিত অনেক উঁচু করে নির্মাণ করা হয় যেন বন্যার পানি ঘরে প্রবেশ করতে না পারে। তাই ঘরবাড়ি নির্মাণে কৌশল অবলম্বন করে দুর্যোগ পূর্ববর্তী সময়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

ঘ. নদী খনন: নদী খনন ব্যবস্থাটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যার পূর্ববর্তী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। যেসব এলাকা প্রতিবছর বন্যার দ্বারা প্লাবিত হয়ে খাল-বিল, নদ-নদী, পলি-বালি, কাদায় ভরে যায় সেসব এলাকার নদ-নদী খনন বা ড্রেজিং করে নদীর প্রবাহ সচল রাখার ব্যবস্থা করতে হয় যেন বন্যার সময় নদী বেশি পানি ধারণ করতে পারে।

ঙ. প্রশিক্ষণ প্রদান: প্রতিরোধ একটি দুর্যোগ পূর্ববর্তী মোকাবিলা। তাই দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলের জনগণকে পূর্ব থেকেই দুর্যোগের ভয়াবহতা ও দুর্যোগসময়কালীন কী করণীয় সে সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়ে রাখা হয়, যেন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কম হয়।

এছাড়াও দুর্যোগ পূর্ববর্তী সময়ে যেসব প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা হলো-

i. দুর্যোগপ্রবণ এলাকার লাইব্রেরি ও আর্কাইভের জন্য বীমা করে রাখা।

ii. প্রয়োজনীয় নথিপত্রের কপি নিরাপদে সংগ্রহ করে রাখা।

iii. ঝুঁকিপূর্ণ ভবন পূর্বেই সংস্কার করা।

iv. স্বয়ংক্রিয় অগ্নিনির্বাপক ও পানি সেন্সিং এ্যালার্ম স্থাপন করা ইত্যাদি।

২. পূর্বপ্রস্তুতি (Preparedness): দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি বলতে দুর্যোগপূর্ব সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসের ব্যবস্থাসমূহকে বোঝায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় যেসব পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করা যায় তা হলো:

ক. ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল ও জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ; প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বপ্রস্তুতিতে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি। এটা চিহ্নিত করতে পারলে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কিছুটা হ্রাস করা যায় কেননা চিহ্নিত এলাকায় আগে থেকেই কিছু পদক্ষেপ নিয়ে কাজ করলে দুর্যোগের ঝুঁকি কমে যায়।

খ. দুর্যোগ সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন; দুর্যোগের পূর্বে দুর্যোগ সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলে দুর্যোগের পরবর্তী কার্যক্রম সহজ হয়। তাই পরিকল্পনা এমনভাবে করা হয় যেন দুর্যোগের পরে ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠী দ্রুত ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারে।

গ. সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ: দুর্যোগ মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হয়। এটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে গ্রহণ করা হয় যেন ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সম্পদ সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে আরো যেসব পদক্ষেপ নেওয়া যায় তা হলো-

i. দুর্যোগ সংক্রান্ত পরিকল্পনাগুলোর হালনাগাদ তথ্য রাখা ও মাঝে মাঝে তা পরীক্ষা করা হয়।

ii. পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি একত্রে রাখা যেন প্রয়োজনের সময় দ্রুত সরবরাহ করা যায়।

iii. প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে স্বেচ্ছাসেবক গ্রুপ তৈরি করে তার সদস্যদের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর সংরক্ষণ করা।

iv. দুর্যোগ মোকাবিলায় যেসব প্রতিষ্ঠান সাহায্য করতে পারে এমন প্রতিষ্ঠান ও গ্রুপসমূহের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বরের তালিকা তৈরি করে রাখা।

v. জরুরি প্রয়োজনে অর্থায়ন করা এবং বীমা নথির কপি নিরাপদে রাখা।

৩. সাড়াদান (Response): প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সাড়াদান একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। অতীতে দুর্যোগে সাড়াদান সম্পূর্ণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলে ধরে নেওয়া হতো। কিন্তু বর্তমানে সাড়াদান প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার একটি অংশ ধরা হয়। দুর্যোগের পরপরই উপযুক্ত সাড়াদানের প্রয়োজন হয়। সাড়াদানের কার্যক্রমগুলো হলো;

ক. অপসারণ: ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া একটি অন্যতম সাড়াদান কার্যক্রম। দুর্যোগের পরপরই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সম্পদ, জীবজন্তু ও মানুষের বিভিন্ন সাহায্যের প্রয়োজন হয়। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ও জীবজন্তুকে আশ্রয়কেন্দ্রে বা দুর্যোগহীন অঞ্চলে সরিয়ে নেওয়া এক্ষেত্রে প্রধান কাজ।

খ. তল্লাশি ও উদ্ধার তৎপরতা: সাড়াদান প্রক্রিয়াতে মানুষ ও জীবজন্তু তল্লাশি করা হয়। বিপদগ্রস্ত মানুষ বন্যা বা ঘূর্ণিঝড়ে নিরাপদ আশ্রয়স্থলের খোঁজ না পেলে স্বেচ্ছাসেবক দল তল্লাশি চালিয়ে তাদেরকে একত্রিত করে। অনেক সময় মানুষ পানিবন্দী অবস্থায় নিজ বাড়ির চালে বা ছাদে অথবা গাছে অবস্থান করে। এসব বিপদ থেকে উদ্ধার তৎপরতা চালিয়ে তাদেরকে নিরাপদ আশ্রয়ে আনা হয়।

গ. ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ: প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সাড়াদান বা প্রতিক্রিয়া কার্যক্রমে দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা হয়। এতে কী পরিমাণ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা কত, কী পরিমাণ জীবজন্তু মারা গেছে, সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত ইত্যাদি নিরূপণ করে তার তালিকা প্রস্তুত করা হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা

৪. পুনরুদ্ধার (Recovery): প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে পুনরুদ্ধার পর্যায় আরম্ভ হয়। এই স্তরে দুর্যোগ প্রভাবিত এলাকাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়। দুর্যোগে যেসব সম্পদ, মানুষ, পরিবেশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামোর ক্ষতি হয়ে থাকে তা পুনঃনির্মাণের মাধ্যমে দুর্যোগপূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনাকে পুনরুদ্ধার বলে। পুনরুদ্ধার পর্যায়ে দুর্যোগ এলাকার মানুষের জন্য বিভিন্ন সংস্থা, সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে শুষ্ক খাবার, বিশুদ্ধ পানি, স্যালাইন, ভিটামিন, ওষুধপত্র ইত্যাদি সরবরাহ করা হয় যেন তারা ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থা থেকে দ্রুত উদ্ধার পায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রতিরোধ, পূর্বপ্রস্তুতি, প্রতিক্রিয়া বা সাড়াদান ও পুনরুদ্ধার এই চারটি কার্যক্রম ছাড়াও দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রশমন বা Mitigation কেও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। দুর্যোগের দীর্ঘস্থায়ী হ্রাস এবং দুর্যোগের প্রস্তুতিকে দুর্যোগ প্রশমন বলে। মজবুত পাকা ভবন নির্মাণ, শস্য বহুমুখীকরণ, ভূমি ব্যবহারে বিপর্যয় হ্রাসের কৌশল নির্ধারণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শক্ত অবকাঠামো নির্মাণ, কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় লোক স্থানান্তর, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন ইত্যাদি কার্যক্রম দুর্যোগ প্রশমনের আওতাভুক্ত। যেসব এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয় সেসব এলাকায় প্রতিবছর বিভিন্ন দুর্যোগে নানা প্রকার ক্ষয়ক্ষতি হয়। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পূর্ণভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। তাই মানুষকে এই দুর্যোগগুলোর সাথেই কম করতে হবে এবং উপরিউক্ত প্রক্রিয়াগুলো ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলার চেষ্টা করতে হবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – দূষণ ও দুর্যোগ

টপিক – ০৮ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনার গুরুত্ব

উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনার গুরুত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনার গুরুত্ব

বর্তমান সময়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। পরিবেশ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনার ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনার গুরুত্বসমূহ নিচে দেওয়া হলো:

১. যেকোনো উন্নয়নকার্য পরিচালনার ফলে পরিবেশের ওপর কী কী বিরূপ প্রভাব পড়বে তা নির্ধারণ করা সম্ভব।

২. পরিবেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ বিশ্লেষণের পরে কোন কোন দিকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে তা নির্ধারণ করা সম্ভব।

৩. উন্নয়ন কর্মকান্ডের ফলে যেন অধিক পরিমাণ পরিবেশ দূষণ না হয় এবং স্থানীয় বনভূমি, পানির উৎস, কৃষিজমি বা প্রাকৃতিক সম্পদ যেন নষ্ট না হয় তা নিশ্চিত করা সম্ভব।

৪. পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কোনো উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হলে বা না হলে পরিবেশের ওপর কী প্রভাব পড়বে উভয়ই বিবেচনা করা হয়। ফলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ক্ষতিকর দিক থেকে পরিবেশকে রক্ষা করা সম্ভব।

উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনার গুরুত্ব

৫. উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার ফলে যেন প্রাণিবৈচিত্র্য কোনোভাবে বিঘ্নিত না হয় সেদিকেও নজর দেওয়া হয়।
৬. পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনায় প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়।
৭. পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনায় জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার আগে স্থানীয় জনগণের ভূমিকা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করে।
৮. উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনা টেকসই উন্নয়ন (Sustainable Development) নিশ্চিত করে।
৯. পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনায় পরিবেশ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সংযোগ ঘটানো হয়।
১০. পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি নিরসনের উপায়ও আলোচনা করা হয়ে থাকে।

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – দূষণ ও দুর্যোগ

টপিক – ০৯ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১. পরিবেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের যেকোনো নেতিবাচক পরিবর্তনকে কী বলে?
ক. দুর্যোগ খ. বিপর্যয় গ. দূষণ ঘ. দূষক

২. নিচের কোনটি গ্রিনহাউস গ্যাস?
ক. হাইড্রোজেন সায়ানাইড খ. কার্বন মনোক্সাইড
গ. ক্লোরোফ্লুরো কার্বন ঘ. অ্যামোনিয়া

৩. গাছপালা নিধনের ফলে বাতাসে কোন উপাদানটির মাত্রা বেড়ে গিয়ে বাতাস দূষিত করছে?
ক. CH_4 খ. CO গ. 0_2 ঘ. CO_2

৪. CFC বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরকে ধ্বংস করছে?
ক. ট্রপোস্ফিয়ার খ. স্ট্রাটোস্ফিয়ার
গ. ওজনোস্ফিয়ার ঘ. এক্সোস্ফিয়ার

৫. গ্রিন হাউস গ্যাসের মধ্যে কোনটির কারণে বায়ুমণ্ডলের তাপ সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে?
ক. মিথেন খ. CFC গ. কার্বন ডাইঅক্সাইড ঘ. কার্বন মনোঅক্সাইড

৬. শিল্প কারখানা দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে কোন দূষণ সবচেয়ে বেশি হয়?
ক. শব্দ খ. মাটি গ. পানি ঘ. আর্সেনিক

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৭. দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায় নিচের কোন দূষিত পদার্থের কারণে?
ক. হাইড্রোজেন সালফাইড খ. হাইড্রোজেন সায়ানাইড
গ. অ্যামোনিয়া ঘ. বেঞ্জ পাইরিন

৮. অবিনাশী বর্জ্য হিসেবে পরিচিত কোনটি?
ক. পলিথিন খ. কাগজ গ. তেজস্ক্রিয় ঘ. ট্যানারি

৯. মাটিতে পচে না এমন ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ কোনটি?
ক. পলিথিন খ. লোহা গ. তেজস্ক্রিয় পদার্থ ঘ. এ্যালুমিনিয়াম

১০. কোন রোগটি পানি দূষণের ফলে হয়ে থাকে?
ক. ক্যান্সার খ. কলেরা গ. স্নায়ু রোগ ঘ. রক্তচাপ

১১. শব্দের তীব্রতা পরিমাপক একক কোনটি?
ক. ডেসিবল খ. হাইড্রোমিটার গ. হাইগ্রোমিটার ঘ. সিসমোমিটার

১২. মানুষের স্বাস্থ্যের উপর পারদ কী ধরনের প্রভাব ফেলে?
ক. স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি খ. রক্তচাপ বৃদ্ধি
গ. অ্যানিমিয়া ঘ.ফুসফুসের নিষ্ক্রিয়তা

১৩. বারিমণ্ডলের দূষণ কোনটি?
ক. মাটি দূষণ খ. বায়ুদূষণ গ. শব্দ দূষণ ঘ. আর্সেনিক দূষণ

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – দূষণ ও দুর্যোগ

টপিক – ১০ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টঙ্গী শিল্প এলাকার নিকটবর্তী আবু মিয়ার ২ বিঘা জমিতে দিন দিন উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। সার ও কীটনাশক প্রয়োগ করে জমির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। কৃষি বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হলে তিনি আবু মিয়াকে সমস্যার সঠিক কারণ ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে পরামর্শ দেন। [রা, বো., কু.বো., চ.বো,, ব.বো. ২০১৮]

ক. দূষণ কাকে বলে?

খ. দূষণের ফলে দুর্যোগের সৃষ্টি হচ্ছে- ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আবু মিয়ার জমিতে সমস্যার ধরন ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আবু মিয়ার জমির সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ বিশ্লেষণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

অলিপুর গ্রামের মাঝখানে একটি বিশাল পুকুর রয়েছে। পুকুরে এক সময় প্রচুর মাছ ছিল। এলাকার সবাই সেখানে গোসল করতো, কাপড় কাঁচতো এবং গবাদিপশু গোসল করাতো। একসময় দেখা যায় পুকুরে আর কোনো মাছ নেই। পুকুরের পানিও ব্যবহার করা যাচ্ছে না।

ক. দূষক কী?

খ. এসিড বৃষ্টি কীভাবে সৃষ্টি হয়?

গ. পুকুরটি কীভাবে দূষিত হয়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত দূষণ প্রতিরোধে গ্রামবাসী কী কী পদক্ষেপ নিতে পারে? বিশ্লেষণ করো।

শিহাব টঙ্গীতে তার চাচার বাসায় বেড়াতে এসে দেখল মামাতো দুই ভাই পেটের পীড়ায় ভুগছে। সে জানতে পারল যে, ঐ এলাকায় লোকজন প্রায়শই আমাশয়, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়। [ঢা. বো., দি.বো., সি, বো, য, বো. ২০১৮]

ক. বায়ু দূষণ কী?

খ. মানবসৃষ্ট দূষণ ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত দূষণের কারণ ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উল্লিখিত দূষণ প্রতিরোধের উপায়সমূহ বিশ্লেষণ করো।

THANK YOU